

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাদকাসক্তি ও এইডস

মাদকাসক্তি হলো ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর এমন একটি মানসিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া যা জীবিত ব্যক্তি ও তার সেবনকৃত মাদকের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। যে দ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে এবং ঐ দ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টি, পাশাপাশি দ্রব্যটি গ্রহণের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এমন দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে। মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি বা নেশাকে বোঝায়। সিগারেট, বিড়ি, তামাক, চুরুট, মদ, গাঁজা, চরস, আফিম, মারিজুয়ানা, হেরোইন, মরফিন, ফেনসিডিল, ইয়াবা ইত্যাদি মাদকদ্রব্য। এ এক ভয়ংকর নেশা। এই নেশায় আসক্ত হলে সহজে কেউ পরিত্রাণ পায় না। আমাদের শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকার কারণে শরীরে কোনো রোগজীবাণু প্রবেশ করলে সহজে শরীরের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু এমন কিছু ক্ষতিকর ভাইরাস আছে যা শরীরের রোগ প্রতিরোধকারী ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে। এইচআইভি তেমনই একটি ভাইরাস। এইচআইভি ভাইরাস রক্ত, বীর্য, যোনিরস, বুকের দুধ প্রভৃতির মাধ্যমে অন্যের দেহে সংক্রমিত হয়। কোনো মানুষের শরীরে এই ভাইরাস প্রবেশ করলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, প্রচলিত চিকিৎসায় সে সুস্থ হয়ে উঠে না। এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত ব্যক্তির অবস্থাকে বা রোগকে এইডস বলে।



এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- মাদকাসক্তির কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারব।
- তামাক ও মাদক দ্রব্য সেবনের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধূমপান ও মাদক থেকে বিরত থাকার কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ মাদকমুক্ত থাকার ব্যাপারে অন্যদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধূমপান ও মাদকের কুফল উপলব্ধি করে এগুলো পরিহার করার ব্যাপারে সচেতন হব।

- মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে সমর্থ হব।
- HIV-AIDS-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশে HIV-AIDS-এর বিস্তার ও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- HIV-AIDS-এর বিস্তার প্রতিরোধে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- HIV-AIDS-থেকে ঝুঁকিমুক্ত থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- HIV-AIDS-প্রতিরোধে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবাদানের ধরন সম্পর্কে জানতে পারব।
- HIV-AIDS-এর পরিণতি উপলব্ধি করে পরিশীলিত জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ-১ : মাদকাসক্তি, তামাক ও মাদকদ্রব্য এবং তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল : মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি বা নেশাকে বোঝায়। যেসব দ্রব্য সেবন বা পান করলে তীব্র নেশার সৃষ্টি হয় সেগুলো মাদকদ্রব্য। কোনো কোনো ওষুধকে ব্যবহারগত কারণে মাদকদ্রব্য বলা হয়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ অতিরিক্ত সেবন করলে এবং এর প্রতি আসক্তি জন্মালে সেটাও মাদকদ্রব্যের আওতায় পড়ে। অতএব যেসব দ্রব্য সেবন করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এবং সেগুলোর প্রতি সেবনকারীর প্রবল আসক্তি জন্মে সেসব দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে। যেমন—বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, মদ, গাঁজা, ভাং, হেরোইন, আফিম, পেথিডিন, ফেনসিডিল, ঘুমের ওষুধ ইত্যাদি। যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে মাদকদ্রব্যের প্রতি তাদের শারীরিক ও মানসিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়। তারা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। যদি কোনো কারণবশত তারা মাদক গ্রহণ করতে না পারে তাহলে তাদের মধ্যে মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক উপসর্গের সৃষ্টি হয়। যেমন—মেজাজ খিটখিটে হয়, ক্ষুধা ও রক্তচাপ কমে যায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়, নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়, আচরণে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে।

ওষুধ ও মাদকদ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য

১. ওষুধ সেবন করলে রোগমুক্তি ঘটে, মাদক সেবনে শরীরের নানা রোগের সৃষ্টি হয়।
২. ওষুধ গ্রহণের মাত্রা নির্ধারিত থাকে, মাদকের মাত্রা নির্ধারিত থাকে না।
৩. অসুখ সেরে গেলে ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মাদকে আসক্ত হলে সহজে ছাড়া যায় না।

বাংলাদেশে যে সকল মাদকদ্রব্য প্রচলিত আছে সেগুলো হলো হেরোইন, আফিম, পেথিডিন, ফেনসিডিল, গাঁজা জাতীয়— মারিজুয়ানা, ভাং, চরস, ইয়াবা এবং ঘুমের ওষুধ, মদ এবং তামাক জাতীয় মাদকদ্রব্য। তামাক গাছের পাতা থেকে তামাকজাতীয় মাদকদ্রব্য তৈরি হয়। তামাক পাতায় নিকোটিন থাকে যা এক ধরনের মাদক। তামাক পাতা দিয়ে বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, পানের জর্দা, গুল, নসিয়া ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

মাদকদ্রব্য গ্রহণের মাধ্যম : যারা মাদকসেবী তারা নানা পদ্ধতি ও মাধ্যমে মাদকদ্রব্য সেবন করে। যেমন ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো, ট্যাবলেট, পাউডার বা সিরাপ হিসেবে খাওয়া, পানীয় হিসেবে পান করা, ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করা। ধূমপানেরও আবার নানা ধরন আছে। যেমন—সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, ঝুঁকা ইত্যাদি।

তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল : তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবন বলতে প্রধানত ধূমপানকে বোঝায়। ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে পৃথিবীতে প্রতি ৮ সেকেন্ডে শুধু ধূমপানজনিত কারণে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হচ্ছে। যারা ধূমপান করে তারা ও ধূমপায়ী ব্যক্তির ছেড়ে দেওয়া ধোঁয়া থেকে অন্যরা নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মাদকদ্রব্য সেবনের কুফলসমূহ হচ্ছে—

১. মাদকদ্রব্য মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। যেমন—শেখার ও কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস করে, চাপ সহ্য করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে ব্যাহত করে। তাছাড়া মানসিক পীড়ন বাড়িয়ে দেয়।
২. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যন্ত্রণাদায়ক প্রভাব ফেলে। মাদকসেবী পরিবারের সদস্যদের সাথে উগ্র আচরণ করে, পরিবারের শান্তি বিনষ্ট করে।
৩. শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। মাদকদ্রব্য সেবন মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষকে ধ্বংস করে, খাদ্যাভ্যাস নষ্ট করে, চোখের দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দেয়।
৪. কিছু কিছু মাদক এইচআইভি ও হেপাটাইটিস-বি-এর সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। খাদ্যানালি ও ফুসফুসের ক্যান্সার, কিডনির রোগ, রক্তচাপ প্রভৃতি বহুবিধ রোগের সৃষ্টি করে।
৫. আর্থিক ক্ষতি হয়। নেশার টাকা জোগাতে গিয়ে সংসারে অভাব ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

কাজ-১ : মাদক সেবনকারীদের মাদকের উপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়। এই নির্ভরশীলতার ফলে কী কী ঘটে তা নিচে উল্লেখ করো।

- ১.
- ২.
- ৩.
- ৪.

কাজ-২ : মাদকদ্রব্য গ্রহণের ৪টি কুফল লেখো।

- ১.
- ২.
- ৩.
- ৪.

পাঠ-২ : ধূমপান ও মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকার উপায় এবং এ সম্পর্কে অন্যদের ভূমিকা : ধূমপান ও মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল সম্পর্কে পূর্ববর্তী পাঠে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য বিষয়টি সম্পর্কে শুধু জানাই যথেষ্ট নয়। মানুষের জীবনের জন্য ক্ষতিকর এমন মারাত্মক অভ্যাসটি যাতে ত্যাগ করা যায় সেজন্য এখনই সে বিষয়ে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য প্রথমই দরকার কোনো অবস্থাতেই ধূমপানসহ অন্য কোনো মাদকদ্রব্য গ্রহণ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

কারণ কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালে অজানা বিষয়ের প্রতি প্রচণ্ড কৌতূহল থাকে। এই কৌতূহল ও উত্তেজনাবশে কিংবা বন্ধুবান্ধবসহ কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা ধূমপান বা মাদক সেবন করতে পারে। এই কৌতূহল বা উত্তেজনা সারা জীবনের জন্য তার অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই কৌতূহল মিটাবার পূর্বে ঐ কিশোর বা কিশোরীকে ভাবতে হবে ধূমপান বা মাদক সেবনের ফলে কী কী কুফল দেখা দেবে এবং এই কুফলসমূহ বিবেচনা করলে তার মাদক সেবন করা উচিত হবে কি না। ধূমপান ও মাদক সেবন থেকে বিরত থাকতে হলে নিচের ধারাবাহিক কার্যক্রমগুলো অনুসরণ করতে হবে। যেমন—

১। ধূমপান ও মাদক সেবনের ফলে কী অবস্থা হয়, প্রথমে তা মনে মনে ভাবতে হবে।

২। ধূমপান বা মাদক সেবনের ফলে মা-বাবা, ভাই-বোন বা অভিভাবক এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়বেন, লজ্জিত হবেন। শিক্ষকেরা বিষয়টিকে ভালোভাবে গ্রহণ করবেন না। এ অবস্থা যাতে না হয় সেজন্য ভাবতে ও বিবেচনা করতে হবে।

৩। এরপর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মনস্থির করবে। ধূমপান বা মাদক সেবন না করার বিষয়ে প্রথমেই দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারলে এই সর্বনাশা কাজ থেকে বিরত থাকা যায়।

৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথমে পরিস্থিতি, সমস্যা, বিপদ চিহ্নিত করে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই তথ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা অন্য কোনো সূত্রে সংগ্রহ করতে হবে। তথ্যের প্রেক্ষিতে করণীয় সমাধান চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নের সচেষ্ট হতে হবে।

৫। ধূমপান ও মাদক সেবন থেকে শুধু নিজে বিরত থাকলে চলবে না, বন্ধুবান্ধব, সহপাঠী, পরিচিতজনকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে তারা যেন এই মারাত্মক নেশা থেকে দূরে থাকে।

৬। মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক জেনে সবার উচিত এ থেকে নিজে মুক্ত থাকা, বন্ধুবান্ধব ও অন্যদেরকে এর কবল থেকে মুক্ত থাকতে অর্থাৎ মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে সবাইকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা।

মাদকমুক্ত থাকার ক্ষেত্রে অন্যদের ভূমিকা : মাদকাসক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মাদকাসক্ত বন্ধুবান্ধবদের ক্ষতিকর প্রভাব বেশ বড় ভূমিকা পালন করে। তবে সব বন্ধুই কি মাদকাসক্ত, নিশ্চয়ই না। দু'একজন হয়ত দুর্ভাগ্যক্রমে মাদকাসক্ত হয়, তবে বেশির ভাগ বন্ধুই ভালো হয়। এই ভালো বন্ধুরাই অন্য বন্ধুদেরকে মাদক গ্রহণ না করার জন্য প্রভাবিত করতে পারে। মাদকমুক্ত থাকার ক্ষেত্রে বন্ধু বা সমবয়সি ছাড়াও আরও অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন—সন্তানের প্রতি অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে। এছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষক আদর্শস্বরূপ। শিক্ষকের আদেশ ও উপদেশ শিক্ষার্থীরা আন্তরিকভাবে পালন করে। শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষকের আদেশ ও উপদেশে শিক্ষার্থীরা মাদক পরিহার করে চলতে পারে। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীরাও স্নেহ, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা দিয়ে ছেলেমেয়েদের মাদকমুক্ত থাকতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম যেমন—পত্র পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন মাদক বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। এর বাইরে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা যায়।

কাজ-১ : মাদকদ্রব্য গ্রহণের এমন ৪টি কুফল লেখো যা ভাবলে তুমি কখনো ধূমপান ও মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে পারবে না।

১.

২.

৩.

৪.

কাজ-২ : তোমাদের স্কুলকে ধূমপানমুক্ত রাখার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে? লেখো।

পাঠ-৩ : মাদকাসক্তির ঝুঁকি, ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল : যারা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে নেশাহস্ত হয়ে পড়ে তাদের সংখ্যা অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। মাদকাসক্তদের একটা বড় অংশ হচ্ছে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ। এছাড়াও রয়েছে পথশিশু, শ্রমজীবী শিশু, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকজন যেমন-শ্রমিক, ব্যবসায়ী, রিকশাচালক, বাস-ট্রাক চালক, অন্যান্য পেশার লোকজন এবং যৌনকর্মী। তাদের মধ্যে মাদকাসক্তি বিস্তারের বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে মাদক প্রাপ্তির সহজলভ্যতা। অন্যান্য যেসব কারণ রয়েছে তা হলো হতাশা, বেকারত্ব, পারিবারিক অশান্তি, কৌতূহল, মন্দ বন্ধুদের কাছ থেকে এক ধরনের চাপ ইত্যাদি।

মাদকাসক্তির ঝুঁকি : মাদকদ্রব্য গ্রহণের জন্য কিশোর-কিশোরীদের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়। বন্ধু বা সহপাঠীদের মধ্যে কেউ মাদকসেবী থাকলে সে প্রস্তাব দিতে বা চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া যারা মাদক ব্যবসায়ী বা মাদক বিক্রেতা তারাও কিশোর-কিশোরীদের মাদক গ্রহণের জন্য নানাভাবে প্ররোচিত করতে পারে। এভাবে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বন্ধুরা চাপ সৃষ্টি করলে যদি কেউ চাপের কাছে নতি স্বীকার করে মাদক গ্রহণ করা শুরু করে তবে তার সর্বনাশ ঘটে। আবার মাদক গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়। বন্ধু বা সহপাঠী ছাড়া অন্য কেউ যদি মাদক গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে এবং তা প্রত্যাখ্যান করলে তার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এ ধরনের ঝুঁকির পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলা : প্রথমেই দেখতে হবে মাদক গ্রহণের জন্য যে বা যারা প্ররোচনা দিচ্ছে তার বা তাদের আচরণ, ক্ষমতা, প্রভাব কেমন। এসব দিক বিবেচনা করে মাদক গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হবে যাতে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সময় নিজেকে সংযত রাখতে হবে। আর যদি সরাসরি ‘না’ বলতে পারা না যায় তাহলে কৌশলে পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য সে স্থান ত্যাগ করতে হবে। চাপ সৃষ্টি করা ব্যক্তি যদি বন্ধু বা পরিচিতজন হয় তবে এমনভাবে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হবে যেন সম্পর্ক নষ্ট না হয়। আর যদি মনে হয় যে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কোনো সমস্যার সৃষ্টি হবে না তাহলে তাকে মাদকের কুফল সম্পর্কে বোঝাতে হবে এবং এ পথ থেকে তাকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। আর মাদক গ্রহণের জন্য যদি চাপ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি কোনো ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তবে অবিলম্বে মা-বাবা বা অভিভাবক কিংবা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে বিষয়টি জানাতে হবে। সর্বনাশা মাদক থেকে নিজে দূরে রাখতে হলে কৌতূহলের বশবর্তী হয়েও কোনো মাদক গ্রহণ করা যাবে না। যেকোনো মাদক নিঃসন্দেহে নিজের, পরিবারের ও সমাজের জন্য খারাপ। সর্বোপরি মাদক গ্রহণ না করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে।

কাজ-১ : মাদকাসক্তির ফলে নিজের ও পরিবারের উপর কী কী প্রভাব পড়ে?

কাজ-২ : কোনো ব্যক্তি মাদকগ্রহণ করে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে একটি ক্ষেত্রের সমস্যা উল্লেখ করে তার সমাধান কী হবে তা সংক্ষেপে লেখো।

পাঠ-৪ : মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে জনমত গঠন : মাদকাসক্তি বর্তমান সমাজের জন্য একটি বড় সমস্যা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও মাদকাসক্ত ব্যক্তির সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে এবং তা ক্রমান্বয়ে প্রকট আকার ধারণ করছে। যারা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে তারা তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না বটে, কিন্তু মাদক গ্রহণের কারণে তারা নানা ধরনের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সন্মুখীন হয়। মাদকের কারণে শুধু যে মাদকাসক্ত ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, মাদকাসক্ত ব্যক্তির মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবার জীবনে এর প্রভাব পড়ে এবং সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মাদকাসক্ত ব্যক্তির মাদকের অর্থ জোগাড় করার জন্য চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানিসহ বিভিন্ন অসামাজিক ও বেআইনি কাজকর্মে লিপ্ত হয় যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির জন্য খুবই ক্ষতিকর। মাদকাসক্তির ভয়াবহ পরিণতি থেকে যুব সমাজসহ দেশের সবাইকে রক্ষা করতে হলে মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন ও সোচ্চার করতে হবে। মাদকদ্রব্য যাতে সহজে না পাওয়া যায় তার জন্য যে আইন আছে সে আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। মাদকের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন করে তুলতে জনমত গঠন করতে হবে।

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রোগান ব্যবহার করা ছাড়াও আরও যেভাবে মাদকের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা যায় সেগুলো হচ্ছে—

১. রেডিও-টেলিভিশন, পত্রপত্রিকা ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য গ্রহণের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা।
২. মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও ভয়াবহতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রচার করা।
৩. মাদকবিরোধী সভা-সমিতি, পথ নাটক, গান, কবিতা, নাটক, যাত্রা পালা, অভিনয়, র্যালি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
৪. মসজিদ, মন্দির, গির্জায় মাদকবিরোধী ধর্মীয় বিধান তুলে ধরা ও মাদক গ্রহণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা এবং মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা।
৫. মাদক ও ধূমপানবিরোধী দিবস পালনসহ অন্যান্য সময়ে বিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। যেমন—দলগত আলোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, লিফলেট বিতরণ, পোস্টার প্রদর্শন ইত্যাদি।
৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন অফিস, সংস্থা, দপ্তরকে ধূমপান ও মাদকমুক্ত এলাকা ঘোষণাপূর্বক তা কার্যকর করা।
৭. বিদ্যালয়ের খাতা, নোটবুকের মলাটে মাদকবিরোধী প্রোগান দিয়ে সকলকে সচেতন করা।

জনসচেতনতা সৃষ্টির সময় “মাদক কিছুই দেয় না বরং কেড়ে নেয় সবকিছু” এরূপ প্রোগান দিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারণা চালাতে হবে। মাদকসেবীরা মনে করে মাদক মানুষকে দুঃখ ভুলতে সাহায্য করে এবং আনন্দ দেয়—এটা একেবারেই ভুল ধারণা। মাদক বরং আরও যন্ত্রণা টেনে আনে। কাজেই পরিচিতজনের মধ্যে কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই মিলে তাকে এই সর্বনাশা পথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা উচিত।

কাজ-১ : এমন একটি প্রোগান তৈরি করো যার সাহায্যে মাদকের বিরুদ্ধে জনগণকে আকৃষ্ট ও সচেতন করা যাবে।

কাজ-২ : তোমার এলাকায় ধূমপানবিরোধী প্রচারণা চালাতে তুমি কী করবে?

- ১.
- ২.
- ৩.
- ৪.
- ৫.

পাঠ-৫: এইচআইভি (HIV) ও এইডস (AIDS) কী: এইচআইভি ও এইডস দুটি ইংরেজি শব্দ। শব্দ দুটির পূর্ণাঙ্গ রূপ হচ্ছে- Human Immuno Deficiency Virus (HIV) এবং Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)। এইচআইভি একটি অতি ক্ষুদ্র বিশেষ ধরনের ভাইরাস যা কোনো মানুষের শরীরে নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায়ে প্রবেশ করে রক্তের শ্বেতকণিকা ধ্বংসের মাধ্যমে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। তখন সে ব্যক্তি নানা ধরনের রোগ যেমন ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে ঘনঘন আক্রান্ত হয় এবং কোনো চিকিৎসায় এ সমস্ত রোগ ভালো হয় না। এইচআইভি সংক্রমিত কোনো ব্যক্তির এরূপ অবস্থাকে এইডস (AIDS) বলে। এইচআইভি কোনো ব্যক্তির শরীরের প্রবেশের পর সাথে সাথে কোনো লক্ষণ দেখা দেয় না। এইডস হিসেবে প্রকাশ পেতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। সাধারণত এটা মনে করা হয়ে থাকে যে এইচআইভি সংক্রমণের শুরু থেকে এইডস হওয়ার সময় ৬ মাস থেকে বেশ কয়েক বছর হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫ থেকে ১০ বছর অথবা তারও বেশি সময় পরে এইডস ধরা পড়ে। এই সময়কালকে সুপ্তাবস্থা বলে। এই সময়ের মধ্যে এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তি সংক্রমিত হতে পারে।

এইডস-এর লক্ষণসমূহ : এইডস-এর নির্দিষ্ট কোনো লক্ষণ নেই। তবে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অন্য যে রোগে আক্রান্ত হয় সে রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এর মধ্যে কিছু সাধারণ লক্ষণ আছে। যেমন-(১) এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা কাশি, (২) সারা দেহে চুলকানিজনিত চর্মরোগ, (৩) মুখ ও গলায় এক ধরনের ঘা, (৪) লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া, (৫) স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা কমে যাওয়া ইত্যাদি।

এইডস-এর প্রধান লক্ষণগুলো হলো-

- ১। শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পাওয়া।
- ২। এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা বা খেমে খেমে পাতলা পায়খানা হওয়া।
- ৩। বারবার জ্বর হওয়া বা রাতে শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া।
- ৪। অতিরিক্ত ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করা।
- ৫। গুকনো কাশি হওয়া ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, কারোর মধ্যে উপরের একাধিক লক্ষণ দেখা দিলেই তার এইডস হয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। তবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে HIV সংক্রমণের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

এইচআইভি এবং এইডস-এর বিস্তার : এইচআইভি একটি নীরব ঘাতক। এই নীরব ঘাতকের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আগে এইচআইভি ও এইডস কীভাবে বিস্তার লাভ করে তা আমাদের জানা প্রয়োজন। বায়ু, পানি, খাদ্য বা কারোর সংস্পর্শে এইচআইভি ছড়ায় না। HIV আক্রান্ত মানুষের শরীরের ভিতরে রক্ত, বীর্য, যোনিরস, মায়ের বুকের দুধ এগুলোতে HIV বাস করে। HIV আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, বীর্য, যোনিরস সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করলে বা মায়ের বুকের দুধ খেলে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে। সুনির্দিষ্টভাবে যে যে উপায়ে এইচআইভি বিস্তার লাভ করে, তা হলো :

১। অনৈতিক ও অনিরাপদ দৈহিক মিলন—এইচআইভি ছড়ানোর সবচেয়ে বড় কারণ অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সারা বিশ্বের এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তিদের ৮০% অনিরাপদ যৌন মিলনের কারণে হয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তির বীর্য বা যোনিরসের মাধ্যমে যৌনসঙ্গীর দেহে এইডস-এর ভাইরাস প্রবেশ করে।

২। আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ—এইডস আক্রান্ত কোনো মানুষের অঙ্গ প্রতিস্থাপন কিংবা তার ব্যবহৃত সূচ-সিরিঞ্জ অন্য মানুষ ব্যবহার করলে ব্যবহারকারীর শরীরে এই ভাইরাস ছড়িয়ে যেতে পারে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির প্রায়ই একই সূচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করে মাদক গ্রহণ করে থাকে।

৩। মায়ের শরীর থেকে শিশুর শরীরে সংক্রমণ—

এইচআইভি ও এইডস আক্রান্ত মায়ের নিকট থেকে তিনটি পর্যায়ে শিশুর শরীরে এর ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে। যেমন—

(ক) গর্ভকালীন সময়ে।

(খ) প্রসবকালীন সময়ে।

(গ) মায়ের দুধ পান করে।

যেসব কারণে এইচআইভি-এইডস-এর বিস্তার লাভ করে না তা নিচে উল্লেখ করা হলো—

(১) হাঁচি, কাশি, কফ-থুতু বা শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে।

(২) এক সাথে এক ঘরে বসবাস করলে, একসাথে বা একই থালা-বাসনে খাওয়া দাওয়া করলে।

(৩) একসাথে খেলাধুলা বা একই ক্লাসে পড়াশোনা করলে।

(৪) আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে হাত মেলালে, কোলাকুলি করলে এবং তার কাপড় ব্যবহার করলে।

(৫) মশা বা কোনো পোকামাকড়ের কামড়ে।

(৬) আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করলে।

(৭) একই গোসলখানা বা শৌচাগার ব্যবহার করলে।

এইচআইভি ও এইডস-এর মতো মরণব্যায়ির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সকলের এ বিষয়ে জানতে হবে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- কাজ-১ : এইচআইভি ও এইডস আক্রান্ত হলে যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায় তা বোর্ডে লেখো এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।
- কাজ-২ : এইচআইভি কীভাবে ছড়ায় এবং ছড়ায় না এ বিষয়ে নিচের বিবৃতির বিপরীতে সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লোখো।

বিবৃতি	স/মি	বিবৃতি	স/মি
১. এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করলে		৭. আক্রান্ত ব্যক্তিকে সেবা করলে	
২. আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে একই থালায় খাবার খেলে		৮. আক্রান্ত ব্যক্তির কাপড়চোপড় ব্যবহার করলে	
৩. আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত নিজ শরীরে গ্রহণ করলে		৯. আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সূচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে	
৪. সুস্থ ব্যক্তির শরীরে জীবাণুমুক্ত রক্ত সঞ্চালন করলে		১০. আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে	
৫. মশা বা পোকামাকড়ের কামড়ে		১১. আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে	
৬. আক্রান্ত মায়ের দুধ পান করলে			

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তামাক পাতা দিয়ে কী তৈরি হয়?

- | | |
|----------|----------|
| ক. আফিম | খ. গাঁজা |
| গ. চুরুট | ঘ. ভাং |

২. মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে—

- অসংলগ্ন আচরণ পরিলক্ষিত হয়
- পারিবারিক অশান্তি ঘটে
- খাবারের রুচি হ্রাস পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৩. মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাটি সবচেয়ে ভালো?

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ক. নিয়ন্ত্রণমূলক | খ. শাস্তিমূলক |
| গ. সহায়তামূলক | ঘ. প্রতিরোধমূলক |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রানা প্রাজা ধসে আহত শামীমকে চিকিৎসার জন্য কর্তৃপক্ষ তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তার তার অত্যধিক রক্তক্ষরণ দেখে দ্রুত রক্ত দেওয়ার কথা বলে। শামীমকে বাঁচানোর তাগিদে উপস্থিত একজন ব্যক্তি তাকে দ্রুত এক ব্যাগ রক্ত দেন। রক্ত নেওয়ার পর অন্যান্য চিকিৎসা শেষে দুই সপ্তাহ পর মোটামুটি সুস্থ হয়ে শামীম বাড়ি ফিরে যায়। মাসছয়েক পর তার শরীরে চুলকানি ও শুকনো কাশি দেখা দেয়। এসবের পাশাপাশি ঘন ঘন জ্বর, পাতলা পায়খানাও হতে লাগল। সে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে কিছু ওষুধ দেন এবং পরিবারকে তার প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করতে পরামর্শ দেন।

৪. শামীম কী রোগে আক্রান্ত হয়েছে?

- | | |
|---------------|-------------|
| ক. ডায়াবেটিস | খ. হাঁপানি |
| গ. এইডস | ঘ. টাইফয়েড |

৫. শামীমের স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন—

- মানসিক প্রশান্তি
- উপযুক্ত সেবা প্রদান
- পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দশম শ্রেণির ছাত্র সজল একজন ভালো ছাত্র। কিছুদিন যাবৎ সে নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে না। প্রায়ই রাত্তায় দুট ছেলেদের সাথে চলাফেরা করতে দেখা যায়। শ্রেণিশিক্ষক বিষয়টি তার বাবাকে জানানেন। সজলের বাবা নিজেও বিষয়টি লক্ষ করলেন এবং বললেন সে ইদানীং অনেক রাত করে বাড়ি ফিরে। কিছু জিজ্ঞেস করলে রেগে যায়। আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে। সজলের বাবা তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য শিক্ষক, প্রতিবেশী ও তার বন্ধুদের সহযোগিতা চাইলেন। বন্ধুরা তাকে নিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যায়। মাঝে মাঝে খেলাধুলায় এবং নয়নাভিরাম স্থানে বেড়িয়ে আসে। কিছুদিন পর দেখা গেল সে সুস্থ হয়ে উঠছে।

ক. মাদকদ্রব্য কী?

খ. শেখার ও কাজ করার ক্ষমতাহ্রাস পায় কেন তা ব্যাখ্যা করো।

গ. সজলের সমস্যাটি কী ধরনের? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সজলের সুস্থতার পিছনে কার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি বলে তুমি মনে কর? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।